IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

উনিশ শতকের বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে বৃত্তিমুখী শিক্ষা

ড. সামিম আহমেদ মোল্লা

KEY WORDS-

শিক্ষা ব্যবস্থা ,প্রযুক্তিগত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ, সমাজসংস্কার আন্দোলন, আত্মনির্ভরতা, কর্মদক্ষতা ও বাস্তব শিক্ষার গুরুত্ব।

সার সংক্ষেপ-

বৃত্তিমুখী শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পেশা বা কারিগরি কাজে দক্ষ করে তোলা হয়। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি কোনো পেশায় যুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে।বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়, যেমন— কারিগরি শিক্ষা – ইলেকট্রিক কাজ, মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। কৃষি শিক্ষা – আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, পশুপালন, মৎস্যচাষ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা – নার্সিং, ফার্মেসি সহকারী। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি – সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন। হোটেল ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা – রান্না, হোটেল সার্ভিস, পর্যটন গাইড। বর্তমান যুগে বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রথমত, এটি বেকারত্ব সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশ ---- ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি কাজের মাধ্যমে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষা চালু হওয়ার ফলে সাধারণ শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমে যায়। তবে পরবর্তীকালে শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়।উনিশ শতকে বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার শুধু ধারণাগতভাবে নয়, ব্যক্তিবিশেষ, প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাস্তবে গড়ে উঠতে শুরু করে।বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারের উদাহরণ ----১। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সূচনা - উনিশ শতকে বাংলায় বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল, নির্মাণকাজ, যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ফলে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২। কৃষি শিক্ষার প্রসার- বাংলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর হওয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

মূল প্রবন্ধ:-

মানুষের জীবনধারণ ও সমাজের উন্নতির জন্য শুধু সাধারণ তাত্ত্বিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। বাস্তব জীবনে কাজ করার দক্ষতা অর্জনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট কোনো পেশা, কাজ বা দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করে এবং জীবিকা অর্জনের উপযোগী হয়ে ওঠে, তাকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা বলা হয়। আধুনিক যুগে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা হলো এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পেশা বা কারিগরি কাজে দক্ষ করে তোলা হয়। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি কোনো পেশায় যুক্ত হয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে। শিক্ষাবিদদের মতে, বৃত্তিমুখী শিক্ষা এমন এক ধরনের শিক্ষা যা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করে।

বৃত্তিমুখী শিক্ষার কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে— প্রথমত, এই শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এটি নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক শিক্ষা; অর্থাৎ কোনো বিশেষ কাজ বা পেশা শেখানো হয়। তৃতীয়ত, এতে স্বনির্ভরতা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, এই শিক্ষায় কারিগরি দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা যায়। পঞ্চমত, এটি অল্প সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ দেয়। বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো— শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পেশার জন্য দক্ষ করে তোলা, বেকারত্ব কমানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলা। দেশের শিল্প, কৃষি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা। তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কাজ শেখানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রদান করা হয়, যেমন— কারিগরি শিক্ষা – ইলেকট্রিক কাজ, মেকানিক, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি। কৃষি শিক্ষা – আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, পশুপালন, মৎস্যচাষ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সহায়তা – নার্সিং, ফার্মেসি সহকারী। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি – সফটওয়্যার, ডাটা এন্ট্রি, গ্রাফিক ডিজাইন। হোটেল ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা – রান্না, হোটেল সার্ভিস, পর্যটন গাইড। বর্তমান যুগে বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। প্রথমত, এটি বেকারত্ব সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এই শিক্ষা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃতীয়ত, বৃত্তিমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরি হয়, যা শিল্প ও প্রযুক্তির বিকাশে সহায়ক। চতুর্থত, এটি স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, ফলে মানুষ নিজেই কাজ শুরু করতে পারে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা মানুষের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কাজ ও পেশা শিখে এসেছে। তবে প্রাচীন যুগে এই শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না; পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যেই কাজ শিখে নেওয়া হতো। ধীরে ধীরে সমাজ ও অর্থনীতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি সংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে ওঠে। শিল্পবিপ্লবের পরে এই শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়।

প্রাচীন সমাজে মানুষের প্রধান কাজ ছিল শিকার, কৃষিকাজ, পশুপালন এবং বিভিন্ন হস্তশিল্প। তখন কোনো বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না; পরিবার ও সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই নতুন প্রজন্ম এসব কাজ শিখত। ভারতীয় সমাজে বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে পেশার একটি সম্পর্ক ছিল। বিভিন্ন বর্ণ বা গোষ্ঠীর মানুষ নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকত—যেমন কৃষি, লৌহকার্য, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প ইত্যাদি। এই পেশাগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতো। ফলে বলা যায়, প্রাচীন যুগেই বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রাথমিক রূপ বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগে শহর ও বাণিজ্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কারিগরি ও শিল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইউরোপে তখন গিল্ড ব্যবস্থা (Guild System) চালু ছিল। গিল্ড ছিল কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংগঠন, যেখানে নতুন শিক্ষানবিশরা অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে কাজ শিখত। এই শিক্ষানবিশ প্রথার মাধ্যমে কাঠমিস্ত্রি, লৌহকার, বয়নশিল্পী, স্বর্ণকার ইত্যাদি পেশার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে শিল্প, যন্ত্রপাতি এবং কারখানার ব্যাপক উন্নতি ঘটে। এর ফলে দক্ষ শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদদের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকেই বিভিন্ন দেশে কারিগরি বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। জার্মানি, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে একটি সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপ দেওয়া হয়। বিশেষ করে জার্মানির ডুয়াল সিস্টেম (Dual System)— যেখানে বিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক শিক্ষা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একসঙ্গে দেওয়া হয়—বিশ্বব্যাপী বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশ ---- ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন হস্তশিল্প ও কারিগরি কাজের মাধ্যমে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষা চালু হওয়ার ফলে সাধারণ শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমে যায়। তবে পরবর্তীকালে শিল্প ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা (Wardha Scheme of Basic Education)–এ মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনমূলক কাজ যুক্ত করার কথা বলেন। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন—যেমন কোঠারি কমিশন (1964–66)—বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ১৯৫২ সালে মুদালিয়ার কমিশন মাধ্যমিক স্তর থেকেই বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করে। ভারতের দিকে দিকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্রথম জাগরণের এই জোয়ার ক্রমশ স্থিমিত হয়ে আসে।বর্তমানে ভারতে আইটিআই (Industrial Training Institute), পলিটেকনিক কলেজ, বিভিন্ন স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনের মাধ্যমে বৃত্তিমুখী শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে।

বৃত্তিমুখী শিক্ষায় বাঙালি সমাজের ভূমিকা ---- বৃত্তিমুখী শিক্ষা সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার সমাজেও প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কারিগরি ও পেশাভিত্তিক কাজের প্রচলন ছিল। কৃষি, হস্তশিল্প, বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, নৌনির্মাণ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি নানা পেশার মাধ্যমে বাঙালি সমাজ বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষার রূপ ও পরিসরও বিস্তৃত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় শিক্ষা শুধু ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং জীবিকা নির্বাহের জন্য বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতাও শেখানো হতো। পরিবার ও সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তরুণ প্রজন্ম কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি শিখত। বাংলার বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়—যেমন কুমোর, কামার, তাঁতি, সুবর্ণকার প্রভৃতি—নিজ নিজ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত করত। এই ধারাই মূলত বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলে। মধ্যযুগে বাংলায় শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মসলিন, রেশম, নকশিকাঁথা, ধাতুশিল্প ও মৃৎশিল্প আন্তর্জাতিক বাজারেও খ্যাতি অর্জন করে। এসব শিল্পের পেছনে বাঙালি কারিগরদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখনও এই শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত না হলেও পরিবার, কর্মশালা ও সমাজের মাধ্যমে শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ফলে বাংলার সমাজে বৃত্তিমুখী দক্ষতা বিকাশের একটি শক্তিশালী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হলেও কিছু বাঙালি শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তারা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ওপর গুরুত্ব দেন। এই সময়ে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাঙালি সমাজের প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা বুঝতে পারেন যে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা জরুরি। আধুনিক যুগে বাঙালি সমাজ বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজ, আইটিআই, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে নানা পেশায় দক্ষ করে তোলা হচ্ছে।

বাংলার মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কৃষি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তিমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে অনেকেই নিজেরাই কর্মসংস্থান তৈরি করছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাঙালি সমাজ বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবারভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ, শিল্প ও হস্তশিল্পের ঐতিহ্য, শিক্ষাবিদদের উদ্যোগ এবং আধুনিক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—সব মিলিয়ে বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারে বাঙালি সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে।

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ যুগ। এই সময়ে ইংরেজ শাসনের প্রভাবে বাংলার সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে শিক্ষাকে জীবিকা ও বাস্তব কাজের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটে বাঙালি সমাজে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটতে শুরু করে। তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত সাহিত্য ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। এর ফলে অনেক শিক্ষিত যুবক কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। শিল্প, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাবও ছিল। এই পরিস্থিতিতে সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাবিদরা উপলব্ধি করেন যে শিক্ষাকে কর্মমুখী করা প্রয়োজন। ফলে কারিগরি শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। উনিশ শতকে অনেক বাঙালি শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা মনে করতেন শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে আত্মনির্ভর করে তুলবে এবং সমাজের উন্নয়নে সহায়ক হবে। তাদের চিন্তাধারায় শিক্ষার সঙ্গে শ্রম, শিল্প ও বাস্তব কাজের সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসারের উদাহরণ ----১। কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সূচনা - উনিশ শতকে বাংলায় বিভিন্ন কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল, নির্মাণকাজ, যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ফলে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২। কৃষি শিক্ষার প্রসার- বাংলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর হওয়ায় কৃষির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষি শিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কৃষিকাজের উন্নত পদ্ধতি, সেচ ব্যবস্থা এবং নতুন ফসল উৎপাদনের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ৩। শিল্প ও হস্তশিল্প শিক্ষা - বাংলায় তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প ও নৌনির্মাণের মতো শিল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল। উনিশ শতকে এসব শিল্পের উন্নতির জন্য কারিগরি দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ পদ্ধতিতে তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। ৪। শিক্ষাচিন্তায় কর্মমুখী ভাবনা - উনিশ শতকের অনেক বাঙালি চিন্তাবিদ শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। তারা মনে করতেন শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা মানুষকে কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভর করে তুলবে।

উনিশ শতকে বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার শুধু ধারণাগতভাবে নয়, ব্যক্তিবিশেষ, প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বাস্তবে গড়ে উঠতে শুরু করে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তিত্ব, তাদের উদ্যোগ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলসহ উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হলো ----

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — শিক্ষা সংস্কার ও ব্যবহারিক শিক্ষার ধারণা (অঞ্চল: কলকাতা এবং মেদিনীপুর জেলা)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান সংস্কারক ছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষা শুধু পুঁথিগত জ্ঞানের জন্য নয়, মানুষের বাস্তব জীবন পরিচালনার জন্যও প্রয়োজন। কলকাতায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার আনেন এবং গণিত, বিজ্ঞান ও বাস্তব জ্ঞানের ওপর গুরুত্ব বাড়ান। তার রচিত "বোধোদয়" বইয়ে শিশুদের বাস্তব জীবন, সমাজ ও কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই চিন্তা পরবর্তীকালে বৃত্তিমুখী শিক্ষার ধারণাকে শক্তিশালী করে।

২। রাজা রামমোহন রায় — আধুনিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার দাবি (অঞ্চল: কলকাতা) । রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার প্রচারের জন্য আন্দোলন করেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেন যাতে ভারতীয়দের জন্য এমন শিক্ষা চালু করা হয় যেখানে বিজ্ঞান, গণিত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকবে। তার এই প্রচেষ্টার ফলেই কলকাতায় আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং পরবর্তীকালে কারিগরি ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরি হয়।

৩। Calcutta Medical College প্রতিষ্ঠা (অঞ্চল: কলকাতা) । ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল ভারতের প্রথম আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি। এখানে ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যচিকিৎসা ও অ্যানাটমি শেখানো হতো। এই শিক্ষা সরাসরি একটি পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফলে এটি উনিশ শতকের বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

৪। Bengal Engineering College (বর্তমান IIEST) (অঞ্চল: শিবপুর, হাওড়া)। ১৮৫৬ সালে শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রকৌশলবিদ্যা, নির্মাণবিদ্যা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেওয়া হতো। রেলপথ, সেতু ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি উনিশ শতকে বাংলায় প্রযুক্তি ও প্রকৌশলভিত্তিক বৃত্তিমুখী শিক্ষার বড় উদাহরণ।

৫। মহেন্দ্রলাল সরকার — বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসার (অঞ্চল: কলকাতা) । মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বিজ্ঞান গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চালু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়, যা পরে প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সহায়ক হয়।

৬। প্রফুল্লচন্দ্র রায় — শিল্প ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা (অঞ্চল: কলকাতা) । প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন শিক্ষাকে শিল্প ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্রদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করেন। তার এই উদ্যোগ শিক্ষাকে শিল্প ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করে, যা বৃত্তিমুখী শিক্ষার ধারণাকে বাস্তবে রূপ দেয়।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিক্ষা ও কর্মের সমন্বয় (অঞ্চল: শান্তিনিকেতন, বীরভূম) । উনিশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে প্রকৃতি ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করার ধারণা দেন। পরে শান্তিনিকেতনে শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষিকাজ, হস্তশিল্প ও বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে ছাত্ররা শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বাস্তব কাজের দক্ষতাও অর্জন করত।

উনিশ শতকে বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, সমাজসংস্কারক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে। কলকাতা, শিবপুর, শান্তিনিকেতন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চিকিৎসা, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার পথ খুলে দেয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ব্যক্তিত্বদের চিন্তাধারা ও উদ্যোগের ফলে বাংলায় বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকের বৃত্তিমুখী শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে ইংরেজ শাসনের প্রভাবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কার এবং সাহিত্যিক নবজাগরণের সূচনা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজে কর্মমুখী বা বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। একই সময়ে বাংলা সাহিত্যও সমাজের এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। ফলে উনিশ শতকে বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্য পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতে নতুন প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। শিল্প, বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সাহিত্য ও মানবিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে অনেক শিক্ষিত যুবক চাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে। কারিগরি শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা এবং বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ চালুর মাধ্যমে শিক্ষাকে জীবিকা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

বাঙালি সমাজসংস্কারকদের ভূমিকা

উনিশ শতকে কিছু বাঙালি শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তারা মনে করতেন যে শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বাস্তব জীবনের কাজ শেখাও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত। সমাজসংস্কারকরা শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য নানা উদ্যোগ নেন এবং শিক্ষাকে সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। এই ভাবনা পরবর্তীকালে আধুনিক কারিগরি ও বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রতিফলন

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সমাজজীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে তুলে ধরেছিল। শিক্ষিত বেকারত্ব, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো সাহিত্যিকদের লেখায় প্রতিফলিত হয়। অনেক লেখক তাদের রচনায় দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষা মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কর্মমুখী শিক্ষা ও বাস্তব দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার কথাও সাহিত্যিকরা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সময়ে উপন্যাস, প্রবন্ধ ও নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব সমস্যা তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হয়। উনিশ শতকের বাংলা নবজাগরণ শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ে শিক্ষিত বাঙালি সমাজ শিক্ষা, সমাজ সংস্কার ও আধুনিকতার বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটায়। নবজাগরণের প্রভাবে শিক্ষাকে শুধু বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা হিসেবে নয়, বরং সমাজ ও অর্থনীতির উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে বৃত্তিমুখী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে বলা যায়, উনিশ শতকে বাংলায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একই সময়ে বাংলা সাহিত্য সমাজের এই পরিবর্তন ও সমস্যাগুলোকে প্রতিফলিত করে। ফলে উনিশ শতকের বৃত্তিমুখী শিক্ষা এবং বাংলা সাহিত্য পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে এবং আধুনিক শিক্ষাচিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখক শিক্ষার উদ্দেশ্য, সমাজসংস্কার এবং জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাদের অনেক রচনায় সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বৃত্তিমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী চিন্তা এবং বাস্তব জীবনের দক্ষতার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। নিচে প্রধান কয়েকজন বাঙালি সাহিত্যিক এবং তাদের কোন কোন রচনায় এই প্রভাব দেখা যায় তা আলোচনা করা হলো।

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের — "বোধোদয়"

"বোধোদয়" একটি প্রাথমিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ। এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের সহজ ভাষায় জ্ঞান, নৈতিকতা ও বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় শেখানো। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভাব এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষের জীবনে পরিশ্রম, কর্ম এবং বাস্তব জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয় যেমন—প্রকৃতি, সমাজ, শ্রম, জীবিকা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয়েছে যে মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে কাজ শিখতে হবে এবং পরিশ্রম করতে হবে। অর্থাৎ "বোধোদয়"-এ এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যা মানুষকে নৈতিক ও কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বৃত্তিমুখী শিক্ষার মূল ধারণার সঙ্গে মিল রয়েছে।

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের — "জীবনচরিত"

"জীবনচরিত" গ্রন্থে বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবনকাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভাব এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে মহৎ ব্যক্তিরা জীবনে সফল হয়েছেন পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে শুধু বিদ্যা অর্জন করলেই যথেষ্ট নয়; মানুষের জীবনে সফল হতে হলে বাস্তব কাজের দক্ষতা এবং আত্মনির্ভরতা জরুরি।

এই ভাবনা বৃত্তিমুখী শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, কারণ বৃত্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্যই হলো মানুষকে কর্মদক্ষ ও আত্মনির্ভর করে তোলা।

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের — "বিবিধ প্রবন্ধ"

"বিবিধ প্রবন্ধ" বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন। এতে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভাব এই প্রবন্ধগুলোতে বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে সেই সময়ের শিক্ষা মূলত চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার গুরুত্বও তিনি উল্লেখ করেছেন। এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের — "শিক্ষার হেরফের"

"শিক্ষার হেরফের" রবীন্দ্রনাথের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ যেখানে তিনি তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভাব নিয়ে এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে তৎকালীন শিক্ষা শুধু বইয়ের জ্ঞান শেখায়, কিন্তু মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোনো বাস্তব সম্পর্ক থাকে না। তিনি মনে করতেন শিক্ষা হওয়া উচিত প্রকৃতি, সমাজ ও কাজের সঙ্গে যুক্ত। শিক্ষার্থীদের কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম, হস্তশিল্প ইত্যাদি শেখানো উচিত যাতে তারা বাস্তব জীবনে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। এই ধারণা থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষা ব্যবস্থায় কৃষি, হস্তশিল্প ও বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এটি বৃত্তিমুখী শিক্ষার একটি বাস্তব উদাহরণ।

৫। স্বামী বিবেকানন্দের — "বর্তমান ভারত"

"বর্তমান ভারত" স্বামী বিবেকানন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ যেখানে তিনি ভারতের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৃত্তিমুখী শিক্ষার ভাব নিয়ে এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে ভারতের মানুষের প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্র্য ও বেকারত্ব। এর সমাধান করতে হলে শিক্ষাকে কর্মমুখী ও কারিগরি ভিত্তিক করতে হবে। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা, আত্মনির্ভরতা এবং দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। বিবেকানন্দ বলেন যে দেশের উন্নতির জন্য কৃষি, শিল্প ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি। এই ধারণা বৃত্তিমুখী শিক্ষার মূল নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য শুধু কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের কথাও বলেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন গ্রন্থে শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত করার চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাদের লেখায় পরিশ্রম, আত্মনির্ভরতা, কর্মদক্ষতা ও বাস্তব শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে, যা মূলত বৃত্তিমুখী শিক্ষার ধারণাকেই শক্তিশালী করেছে।

তথ্যসূত্র

১। সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (উনিশ শতক), মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৩। সুকুমার মিত্র — উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪। অমলেন্দু বসু — বাংলার নবজাগরণ ও সমাজচিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

৫। বিনয় ঘোষ — বাংলার সমাজচিত্র (উনিশ শতক), ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

৬। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — বাংলার নবজাগরণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিক্ষা ও শিক্ষাচিন্তা (প্রবন্ধ সংকলন), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

৮। স্বামী বিবেকানন্দ — বর্তমান ভারত ও অন্যান্য প্রবন্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — বোধোদয় ও অন্যান্য শিক্ষামূলক রচনা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ।

১০। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / বিভিন্ন প্রকাশনা, কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুকুমার সেন — বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (উনিশ শতক), মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা।

৩। বিনয় ঘোষ — বাংলার সমাজচিত্র, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

৪। বিনয় ঘোষ — বাংলার নবজাগরণ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা।

৫। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — বাংলার নবজাগরণ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।

৬। সুশোভন সরকার — বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭। অক্ষয়কুমার দত্ত — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দে'জ পাবলিশিং (সংস্করণ), কলকাতা।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শিক্ষা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শান্তিনিকেতন।

৯। স্বামী বিবেকানন্দ — বর্তমান ভারত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা।

১০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — বোধোদয়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা।

১১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

১২। প্রমথ চৌধুরী — প্রবন্ধ সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।